গান তুমি হও

প্রবুদ্ধ বাগচী

কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মুখ্যমন্ত্রীর সংবর্ধনা সভা। গোটা স্টেডিয়ামে উপচে পড়া ভিড়। মঞ্চে সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে রাজ্যের নেতাদের মিলিত জল্পনা। অনুষ্ঠানের হর্তাকর্তারা সেলুলার ফোন নিয়ে মঞ্চের চারপাশে ঘোরাফেরা করছেন। মূল মঞ্চের পাশের ছোট মঞ্চে যন্ত্রানুষঙ্গ নিয়ে গায়ক গায়িকাদের উপস্থিতি। শীতের দুপুরে সবুজ মখমলের মতো ঘাসে পিছলে যাচ্ছে অলস রোদ। সবাই টানটান উত্তেজনায় অপেক্ষা করছেন কখন এসে পৌঁছবেন আজকের অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু স্বয়ং অবসৃত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। অধীর চিত্রসাংবাদিকেরা ক্যামেরা তাক করে আছেন প্রবেশপথের দিকে, নিরাপত্তারক্ষীরা শেষবারের মতো হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছেন নিজেদের প্রস্তুতির। এমন সময় দুধসাদা অ্যামবাসাডারের দরজা খুলে তাঁর এগিয়ে আসা। কয়েকশো মাইকে মুহূর্তে ধবনিত হয়ে উঠল ঃ জয় হোক জয় হোক / নব অণোদয় ... যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি ধীরে ধীরে পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে মূল মঞ্চে তার জন্য নির্দিষ্ট আসনটিতে বসলেন, ততক্ষণ বাতাসে ভেসে থাকল ওই বিশেষ গানের কথা আর সুর।

প্রশ্নটা এটা নয় যে, স্বাধীন ভারতের জীবন্ত কিম্বদন্তী এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সম্বর্দ্ধনাসভায় রবীন্দ্রনাথের এই গান গাওয়ার বৈধতা কতখানি, বরং জিজ্ঞাসাটা অন্য জায়গায়। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের ষাট বছর পরেও আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের নানা ঘটনাকে বিশেষ মাত্রায় স্মরণীয় করে রাখার জন্য কেন এখনও তাঁর গানের কাছে আমাদের ঋণী হতে হবে? ভুল বোঝার কোন অবকাশ রাখা উচিত নয়, এই প্রশ্নের মানে এটা নয় যে রবীন্দ্রনাথের গানকে গায়ের জোরে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।কার্যত সেটা এক অসম্ভব প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি সৃষ্টিই তাদের শিল্পগুণের দীপ্তিতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত হচ্ছে, তাঁর গানের ক্ষেত্রে এই ধারাবাহিকতা আরও ভাস্বর, যার জন্য আমাদের যথেষ্ট গৌরবের পরিসর আছে। কিন্তু সেটা বহু আলোচিত প্রসঙ্গ।বরং মনে করে দেখা দরকার, রবীন্দ্রনাথ যেমসয় গান লেখার কথা ভাবেন, তখন বাংলা গানের আধুনিকমনস্ক সামাজিক প্রেক্ষিত ছিলনা, কোন স্পষ্ট আদল ছিল না, যা এক আন্তভাবে বাংলার, বাঙালির। ফলে রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক প্রতিভার একটা দিক যেমন নিয়োজিত থেকেছে অসাধরণ কথা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সুরের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ নতুন মাত্রার এক শিল্পবস্তুর নির্মাণে, অন্যদিকে সেই বিরল প্রতিভার মননের অর্ন্তগত হয়ে ছিল এমন একটা অভিনিবেশ যে, তিনি যা সৃষ্টি করছেন তা বাঙালির গানের একটা নিজস্বতার পথকে প্রশস্ত করবে, এক স্বাতন্ত্র্যের পথে এগিয়ে দেবে বাংলাগানকে, যে গান সমস্ত প্রেক্ষাপটে গাওয়া যাবে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এই ভাবনার সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ নানা ধরণের আনুষ্ঠানিকতার অনুষঙ্গে গান রচনা করেছেন বারবার -------- কখনও তা প্রিয়জনের জন্মদিন, কখনও তা ঘনিষ্ঠজনের বিচ্ছেদ, কখনও বা বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, বিদ্যালয়ের প্রার্থনাসঙ্গীত ইত্যাদি নানা ধরণের ছোট-বড় অনুষঙ্গ। গানকে জীবনযাপনের প্রতিটি খুটিনাটির মধ্যে অন্বিত করার এই চিন্তা রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় নতুন মাত্রা পেয়েছে। কারণ, আমাদের সমাজেরযে চিরায়ত লোকজীবন সেখানে কিন্তু বাংলাগানের এই ভূমিকাটা আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই। ছোট শিশুকে ঘুমপাড়ানোর জন্যই বলুন বা কৃষিকাজের স্বার্থে বর্ষার আহ্বানেই বলুন অথবা দাঁড় বেয়ে নৌকা বাওয়ার সময় বা বিয়ের আসরে গানের প্রচলন খুবইপুরোনো রীতি। কিন্তু সেসব গানের আধুনিকীকরণের প্রয়োজন ছিল সময়ের মূল্যবোধের সঙ্গে তাল রেখে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এইপ্রয়োজনীয়তাকে এড়িয়ে যায়নি। তাঁর সাফল্য এখানেই যে ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত বাঙালি নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের জন্ম হয়েছিল, তাঁদের চি, মূল্যবোধ ও সামাজিক-রাজনৈতিক-বৌদ্ধিক প্রেক্ষিতে উপলব্ধি করে তাঁর গান মানানসই হয়ে উঠেছিল সামগ্রিকভাবে। এই প্রয়াসে তাকে যেমন ঐতিহ্যছুট বলার সুযোগ নেই, তেমনি নিছক ঐতিহ্য-অনুসারী এইশিরোপায় তার গানের ক্ষেত্রে বেমানান। কারণ, ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের পাশাপাশি দেশজ লে

াকগান বিদেশী সাঙ্গীতিক ঘরাণা সবই রবীন্দ্রনাথের গানে ঠাঁই পেয়েছে — বাংলাগানের যেন এক ধরণের ঝিায়নই হয়ে গেছে তার গানের মধ্যবর্তিতায়। তাই সব মিলিয়ে আজকের যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালিসমাজ, যারা মূলত ওই নবজ াগরণজাত সমাজটির উত্তরাধিকারী তাদের অনেকদিন ফিরে তাকাতে হয়নি নতুনতর গানের সন্ধানে, রবীন্দ্রনাথ এতটাই পেরেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বকে এতটুকু লঘু না করেও এই কথাটা কি পাশাপাশি বলা যাবে না, রবীন্দ্রনাথ-পরবর্তী প্রজন্মের একটা দুর্বলতার ও ব্যর্থতার চিহ্নও এখান থেকে ফুটে ওঠে?

এটা একরকম ভাবনার কথা বৈ কি? রবীন্দ্রনাথের সমকালে তাঁর যে অন্যান্য সাহসিকতাগুলি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধসবই পরবর্তী সময়ে সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে ঠিকই কিন্তু সেটা একচেটিয়া প্রভাব কেটে পেরিয়ে আরও নানান ভ াবনার বিভঙ্গ ধরা পড়েছেপরবর্তী সাহিত্যের ইতিহাসে। আজকের গল্প, আজকের কবিতা, আজকের উপন্যাস বা অ াজকের প্রবন্ধের নানা দৃষ্টান্ত যা সমকালের বাঙালির মেজাজ-মানসিকতাকে ধারণ করে আছে, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স াহিত্যকে মেলানো যাবে না, কিন্তু মজার ব্যাপার রবীন্দ্রনাথের কবিতা সেভাবে খুব আলাদা আগ্রহ নিয়ে নিজের তাগিদে পড়েন কিনা সন্দেহ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান তাঁরা দিব্যি শোনেন, তাকে গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা হয় বলে জানা নেই। এর একটা কারণ যদি হয় রবীন্দ্রনাথের গানের এক অসামান্য শিল্পগত উৎকর্ষ অন্যএকটা কারণ কিন্তু বিকল্প অন্যকিছুর অভাব। দুটোর মধ্যে কোন কারণটার দিকে পাল্লা ভারি সে প্রশ্ন ঘিরে অবান্তর বিতর্ক তৈরী করে লাভ নেই, প্রথম ও দ্বিতীয় দুটো কারণ সমানভাবে সত্যি। কিন্তু গানের ক্ষেত্রে বিকল্প কি কিছুই নেই? আজকে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এ প্রশ্নের সামনে নিরন্তর মাথা খোঁড়া ছাড়া আমাদের কিছু করণীয় নেই। কিন্তু বিশেষ যে ঘটনাকে সামনে রেখে এতক্ষণের এইসব কথাবার্তা, তার মধ্যে একটা অন্য ইঙ্গিত আছে। পাঠকের সামনে তা প্রকাশ করা দরকার। দীর্ঘ বন্ধ্যাত্বের পর নববই দশকের শু থেকে বাংলাগানে একট্য অন্যরকম পালাবদল সূচনা হয়েছে, একথা আজ অতি বড় নিন্দুকেরা অস্বীকার করতে পারবেন না। সুমন চট্টোপাধ্যায়ের নতুন ভাবনার জীবনে যার সুত্রপাত, সার বেঁধে আসা আরও অনেকগুলো চেনা নামের মধ্যে তার বিকাশ ও বিস্তৃতি এবং এই গোটা আট-দশ বছর সময়কাল ধরে বাংলাগান নিয়ে এমন একটা অভূতপূর্ব। (কিছুটা অপ্রত্যাশিতও বটে) উন্মাদনা, প্রচার, বিজ্ঞাপণ দেখা গেল এবং এখনও যাচ্ছে, এমনটা আর আগের কোনো সময়ে ঘটেছে বলে আমার মনে হয় না। সম্ভবত ঘটেনি। আগের বাংলাগানের ক্ষেত্রে মূল যে জোরটা ছিল তা হল, অসামান্য সব কণ্ঠশিল্পীদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ও তার সুত্রে অর্জিত জনপ্রিয়তার দিকে অর্থাৎ কয়েকবছর আগে যখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, কিশোরকুমার খ্যাতির মধ্যগগনে তখন তাদের একেকটি অ্যালবাম (ত ারও আগে রেকর্ড) ঘিরে প্রচারের ব্যবস্থা করা হত। তারা গাইছেন বা নতুন রেকর্ড করছেন এটাই ছিল মূল আলোচ্য, কীগান গাইছেন। এটা পরের ব্যাপার। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিষয়টার একটা ছোট্ট পালাবদল হয়েছে। একেবারে প্রথম দিকে সুমন তারপর নচিকেতা ও অঞ্জন দত্তকে ঘিরে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচার যে হয়নি তা নয় তবে তারপরে সামগ্রিকভাবে প্রচ ারটা এসে পড়েছে 'বাংলাগান' এই বিষয়টার উপর। এখানে ওখানে সেখানে অনেক নতুন মুখ বাংলা গানের জগতে এসেছেন এই সময়ে, কিন্তু তাদের ব্যক্তি নামের থেকে বাংলাগানের সঙ্গে তাদের যোগাযোগটাই প্রচারে প্রাধান্য পেয়েছে বেশী। নিঃসন্দেহে এটা একটা গুণগত পরিবর্তন।

এর একটা ভিন্ন মানেও আছে। বাংলাগানের হাল আমলের এই নতুন ঘরাণা বাংলাগানের সঠিক এক আধুনিকতার সূচন া করেছে বলে আমার মনে হয়। ঐতিহাসিক এই আধুনিকতা আরও আগেই আসা বাঞ্ছনীয় ছিল। আসেনি, সেটা আম াদের দুর্ভাগ্য। কে জানে, কখনও ইতিহাসের দিশা বদলে কোনো ব্যক্তিবিশেষের জন্য আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হয়। সে যাই হোক, সামগ্রিকভাবেএই যে তার একটা গুত্বপূর্ণ দিক এটাই যে, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনযাপনের অনেকরকম এযাবৎ-অধরা অঞ্চলকে সে নিজের মানচিত্রে ঠাঁই করে দিতে পেরেছে। সত্তর বা আশির দশক পর্যন্ত বাংলগানের গড়পড়তা লিরিক যে বাঁধাধরা পথে হেঁটেছে, এই সময়ের গানে তার ছকবদল খুব স্পষ্ট। অবশ্য এমনটা না হয়ে উপায় ছিল না। কারণ এই সময়ে যাঁরা নতুন গানের স্রোতে নিজেদের যুক্ত করেছেন তারা পূর্ববর্তী অবস্থার দুর্বলতা সম্বন্ধে ষোল আনার উপর আঠার আনা সচেতন ছিলেন। সচেতন না থাকলে এই নয়া ভাবনার মিছিলে তাদের ঠাঁই হবার উপায় ছিল না। ফলে অনেকরকম গান তৈরী হল। ভাবতে পারেন, ''গান তুমি হও আমার মেয়ের ঘুমিয়ে পড়ামুখ/তাকিয়ে থাকি সেট াই আমার বেঁচে থাকার সুখ''— এধরণের এক অসামান্য পংক্তি তৈরী হয়েছে আমাদের এই আলোচ্য সময়ে — বাংলাগ

ানে এই বাৎসল্যরস কি খুব সুলভ ছিল? অথবা, ভাবুন পারিবারিক বিপর্যয়ে রেলহকার হয়ে যাওয়া সেই যুবকটির কথা নিয়ে অঞ্জন দত্তের সেই অনবদ্য গানখানি, যে রেলস্টেশনে বসে থাকা অচেনা যাত্রীর কাছে প্রস্তাব দেয় ঃ দাদা, একটা মিনি হবে কি? / একটাও লেবু হয়নি বিককিরি ..... এযাবৎ চলে আসা গতানুগতিক বাংলাগানে এ ধরণের চরিত্র নিতান্তই ব্রাত্য হয়ে ছিল। এমন দৃষ্টান্ত আরও বাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব।

কিন্তু দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। বরং যেটা বলতে চাইছি আরেকটু খুলে বলি। নতুন বাংলাগানের মানচিত্রে জীবনের খুঁটিনাটিকে তো অনেকটাই গানের সঙ্গে যুক্ত করে নেবার চেষ্টা হয়েছে এটা আজকে আর অতিকথন নয়। বিষয় হিসাবে এই নবযুগের ধারাঅনেকটাই প্রচারের আনুকূল্য পেয়েছে। মানুষের গ্রাহ্যতার কথাও যদি ধরা যায়, তাও নেহাৎ কম হয়েছে বলে মনে হয় না। বহু মানুষএইসব নতুন গানের শিল্পীদের ক্যাসেট কিনেছেন, শিল্পীদের একক গানের আসরে শ্রোতা উপচে পড়েছে, শুধুমাত্র নতুন গানের ধারা নিয়ে পত্রপত্রিকা-মিডিয়ায় রমরমা আলাপ-আলোচনা বিতর্ক ছাপা হয়েছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা যখন খ্যাতির তুঙ্গে তখনও এতটা প্রচার-প্রসার-বিজ্ঞাপণ হয়েছে কিনা সন্দেহ। এটা কোনো অসূয়ার ব্যাপার নয়, হতেই পারে দুটো পরিস্থিতির মধ্যে অসঙ্গত পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে যা ঘটেছে তাকে খোলা চোখে স্বাগত জানানোই বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়।

কিন্তু এরপরেও উঠে আসে যে অনিবার্য প্রশ্নটা তা হল, এতটা জনপ্রিয়তা ও জনগ্রাহ্যতার পরেও আমাদের ধারাবাহিক গানের ঐতিহ্যে কতটুকু স্থায়ী ভূমিকা তৈরী করতে পারল এই গানের আন্দোলন? একেবারে প্রথমে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সম্বর্ধনাসভায় গান নির্বাচনের প্রশ্নটাকে এ কারণেই সামনে এনেছিলাম যে এই ধরণের অনুষ্ঠানে তো আমাদের সমাজজীবনের অনিবার্য অঙ্গ, সেখানে গান গাওয়ার ব্যাপারটাও প্রচলিত রীতির মধ্যে পড়ে কিন্তু এই অনুষঙ্গে কেন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে না আমাদের নতুন গান? আমাদের নতুন গানের ভাঁড়ারে কি এমন গান সত্যিই নেই, যা খাপ খেয়ে যায় এরকম অজস্র খুঁটিনাটির দৈনন্দিনে? আমরা কি আদৌ খুঁজে দেখছি সেই নতুন গানের ভান্ডার, খুঁজতে চেয়েছি কি কখনও, নাকি, এটা আমাদের এক প্রকট উদাসীনতা ও আবহমান স্ববিরোধ? যে স্ববিরোধ আমাদের প্রবল কৌতূহলে পৌঁছে দেয় নতুন গানের কারিগরদের একক অনুষ্ঠানের মঞ্চে, আর অন্যদিকে ওই অনুষ্ঠান থেকে ফিরে আমরা নির্বিকারে বিস্মৃত হই সজীবতার ভাববস্তু, প্রতিদিনের বাঁচায় গররাজি থাকি ওই গানের নতুনত্বকে স্বীকৃতি দিতে — এভাবেই তৈরী হয়আত্মীকরণের এক দ্ধতা। এই ধূসর স্ববিরোধ থেকেই কি তবে আমরা ফিরেও তাকাই না নতুন গানের দিকে? সেই গতানুগতিক ধারাবেয়ে কি জন্মদিনে, কি আনন্দানুষ্ঠানে, কি বিদায়বাসরে আমরা ফিরে যাই রবীন্দ্রনাথ বা আরও গতানুগত সঙ্গীতের কাছে।

তাহলে এই আপাত জনপ্রিয়তা, মাত্রাছাড়ানো প্রচার শেষপর্যন্ত, নতুন গানের এই আন্দোলনকে কোনখানে দাঁড় করালো এই দশ বছরের পরিসরে? আমি মনে করি না নতুন গানের ধারা ও ধারণা আন্তরিকতায় একনিষ্ঠ নয়, নিশ্চিত এর মধ্যে প্রাণের তাগিদ আছে, উদ্দীপনার স্পন্দন আছে, তবু এটাও সত্যি, একা রবীন্দ্রনাথ যা পেরেছেন একটা সম্মিলিত প্রচেষ্টা তার ধারেকাছেও পৌঁছাতেপারেনি। কেন পারেনি সেটা যাঁরা এর মধ্যে অর্ন্তগত হয়ে আছেন তাঁরা ভাববেন, আমরাও ভাবব, ভাবানোর চেষ্টা করব স্বতন্ত্র পরিসরে ..... কিন্তু তার আগে দেখতে হবে, নতুন গানের এই সম্পন্ন সক্রিয়তা নিয়ে ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা।

বেশ কিছুদিন আগে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সুত্রে নানা কথায় এমন একটা দৃষ্টান্ত এসেছিল। ধন,সুমনের জাগে জাগে রাত / ভোর হবে বলে' গানটিকে দিব্যি একটা চমৎকার খেয়াল হিসেবে গাওয়া যায়, অসাধারণ সুর, একেবারে আধুনিক কথা, কিন্তু খেয়াল গাইবার জন্য আমরা কখনও এই গান নির্বাচন করিনি (সুমন তাঁর নিজের কিছু অনুষ্ঠানে এই গানটিকে খেয়ালের অনুষঙ্গে পরিবেশন করেছেন, সেটা একটা বিচ্ছিন্ন প্রয়াসমাত্র)। এখনও আমরা খেয়ালের কথা বলতে বুঝি বহুকাল ধরে চলেআসা ধর্মাশ্রিত রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক আখ্যানের কিছু প্রাচীনগন্ধী পদ, যার ভাষা আমাদের মুখের ভাষা থেকে যোজন যোজন আলাদা। 'জাগে জাগে রাত' -এর মতো গানকে খেয়াল হিসেবে গ্রহণ করলে ধ্রুপদী সঙ্গীতের তুলসিতলা কি বড় বেশী অশুদ্ধ হয়ে যেত? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায় নিশ্চয়ই গানের শরিক শিল্পীদের নয়। বরং এর জবাব নিহিত আছে আমাদের স্বভাব আর অভ্যাসে, আমাদের মানসিকতার গড়নে গঠনে -- দুর্ভাগ্য হলেও যার নিগড় থেকে আমরা এখনও কোনোভাবে মুক্ত হতে পারিনি। কেন পারিনি কে জানে?

অবশ্য লক্ষ্য করে থাকবেন, আমি স্ববিরোধের আগে 'আবহমান' বিশেষণটি ব্যবহার করেছি। কেন 'আবহমান' ও কারণ

আজকে রবীন্দ্রনাথকে আমরা যে অবস্থায় দেখছি, রবীন্দ্রনাথের সময়কালে প্রেক্ষিতটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই সময়ের আবর্তে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ছিল হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের দাসত্ব ও আনুগত্য থেকে বাংলাগানকে বার করে আনা।তিনি খুব স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে ভুলতে পারার চেষ্টা থেকেই তাঁর গান বাঁধা। তাঁর নির্দিষ্ট আক্ষেপ ছিল ঃ ..... যত পরিশ্রম করিয়াই গান রচনা করা যায় যাক না কেন, পুরাতন রাগরাগিনীর নামে নামে তাহার নামকরণ করা হয় ও রচয়িতার যশের লাঘব হয়। ..... ভৈরো রচনা করিয়া আমার কোনো নাম নেই। একটা অতি প্রাচীন রাগ, একটা সর্বসাধারণের সম্পত্তি, আমি ব্যবহার করিতেছি মাত্র.এই ভাবনারই সূত্রে তিনি ইন্দিরাদেবীকে জানাচ্ছেন ---- 'গানের কাগজে রাগরাগিনীর নাম নির্দেশ না থাকাই ভাল। নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে, রূপের মধ্যে থাকে না। কোন রাগিণী গাওয়া হচ্ছে বলবার কোনো দরকার নেই। কী গাওয়া হচ্ছে সেইটেই মূখ্য কথা, কেননা তার সত্যতা তার নিজের মধ্যেই চরম। 'কিন্তু এসব তো রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় প্রতিবিম্বিত গানের আধুনিকতার ধারণা! সমকাল তাকে তির্যক চোখেই দেখেছে, যেখানে নিন্দিত, সমালোচিত রবীন্দ্রনাথ প্রায় একঘরে তাঁর সময়ে! সেদিনকার বাঙালি সারস্বতসমাজ একইভাবে আক্রান্ত স্ববিরোধের ভাইরাসে, একদিকে নন্দিত রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে তার গানকে গ্রহণের ক্ষেত্রে কেবল কুণ্ঠা আর সংশয়। নইলে রবীন্দ্রনাথের মতো স্থিতধী ব্যক্তিত্ব চিঠিতে লিখছেন ঃ ওস্তাদেরা জানেন আমার গানে রূপের দোষ আছে, তারপর যদি নামেরও ভুল হয়, তবে দাঁড়াব কোথায়? এতটাই তীক্ষ্ম সে বিরূপতার আদল!

এই প্রসঙ্গটার অবতারণা করলাম আসলে একটা আশায় বুক বেঁধে। নতুন গানের পথিকৃৎ ও তার অনুগামীরা কী ভাবছেন জানি না, তবে আমরা যাঁরা নতুনগানের স্রোতে তৃপ্ত অবগাহন করেছি, তাদের ভাবতে ভাল লাগে, হয়তো সময়ের একটা বেষ্টনি অতিক্রম করার পর এই গান কোথাও তার একটা যোগ্য স্বভূমি তৈরী আর চিহ্নিত করে নিতে পারবে। এখনও অনেকদিন আমরা হয়তো শব্দটি ব্যবহার করতেই পছন্দ করব কারণ কমবেশী সংশয়ে আমরাও আচ্ছন্ন আছি। সময়ের বাঁকে বাঁকে কী সম্ভাবনা লুকানো আছে বুজবুকির জ্যোতিষশাস্ত্রে কেন ফলিত বিজ্ঞানও তার হদিশ দিতে পারে না। তবু যদি কল্পনা করা যায়, বেশ কয়েকবার পর এমনই এক রাজনৈতিক নেতার সম্বর্ধনাসভায় শিল্পীর কণ্ঠে উঠে আসবে আজকের কোনো নতুন গানের কলি, অথবা, সদ্য পিতৃত্বের আস্বাদ পাওয়া ভবিষ্যতের কোনো গর্বিত যুবা তার নবীন আত্মজ -র দিকে তাকিয়ে গেয়ে উঠবে ঃ 'তুই হেসে উঠলেই / সূর্য লজ্জা পায় / আলোর মুকুটখানা / তোকেই পরাতে চায়'----- তবে কি আমাকে কেউ ফাঁসিতে ঝোলানোর প্রস্তাব করবেন?